بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ অক্টোবর ২০২২ মোতাবেক ২৮ ইখা ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের প্রেক্ষাপটে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছিল আর তাঁর উত্তম গুণাবলীর উল্লেখ করা হচ্ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মর্যাদা বা তার সম্পর্কে মহানবী (সা.) কী ভাবতেন অথবা তাকে কেমন মর্যাদা দিতেন– এ সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যে সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তা হলো, মক্কী যুগে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর গৃহে দৈনিক দু'একবার যেতেন।

হযরত আমর বিন আস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে যাতুস্ সালাসিলের সেনাদলে সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে তাঁকে নিবেদন করি, মানুষদের মধ্যে থেকে কে আপনার সবচেয়ে প্রিয়? তিনি (সা.) বলেন, আয়েশা। আমি নিবেদন করি, পুরুষদের মধ্যে (কে)? তিনি (সা.) বলেন, তার পিতা। আমি জিজ্ঞেস করি, এরপর কে? তিনি বলেন, এরপর উমর বিন খাত্তাব; আর এভাবেই তিনি (সা.) আরো কয়েকজন পুরুষের (নাম) উল্লেখ করেন।

হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **আবু বকর (উম্মতের) সকল লোকের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, তবে কেউ নবী হলে ভিন্ন কথা।**

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **আমার উম্মতের মধ্য থেকে আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র এবং কৃপাকারী হলো আবু বকর।**

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, উচ্চ মর্যাদার অধিকারীদের নিচে যারা অবস্থান করছে তারা তাদেরকে (সেভাবে) দেখবে যেভাবে তোমরা উদিত তারকারাজি দেখে থাক। অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদার অধিকারীরা যেন তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে যারা তাদের অধীনস্থ। যারা তাদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে তারা যেন তাদের দেখে। অর্থাৎ, উচ্চ মর্যাদার অধিকারীরা এমন উচ্চস্তরে থাকবে যে, যারা নিম্নস্তরে থাকবে তারা তাদেরকে এমনভাবে দেখবে যেভাবে তোমরা উদিত তারকারাজি দেখে থাক, অর্থাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশের দিগন্তে তারকারাজি দেখে থাক। আর আবু বকর ও উমর তাদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারাও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তাদেরকে মানুষ এমনভাবে দেখবে যেভাবে সুদূর (আকাশের) তারকারাজি দেখে। তিনি (সা.) বলেন, আর তারা উভয়ে কতই না উত্তম!

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর ছাড়া আর কারোই আমাদের প্রতি এমন কোনো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান আমরা দেই নি। আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে এর প্রতিদান কিয়ামত দিবসে দিবেন।

মহানবী (সা.) তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় বলেন, মানুষের মাঝে এমন কেউ নেই যে নিজ প্রাণ ও সম্পদের মাধ্যমে আমার সাথে আবু বকর বিন আবু কোহাফার চেয়ে অধিক উত্তম আচরণ করেছে। মানুষের মধ্য থেকে আমি যদি কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ

করতাম। কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্ব সর্বোত্তম। এই মসজিদের সবগুলো জানালা আমার পক্ষ থেকে বন্ধ করে দাও, শুধুমাত্র আবু বকরের জানালা ব্যতিরেকে। এটি সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত।

মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর আমা হতে আর আমি তার হতে। ইহকাল ও পরকালে আবু বকর আমার ভাই।

সুনানে তিরমিযীর রেওয়ায়েত হলো, হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর সম্পর্কে বলেন, তারা উভয়েই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জ্যেষ্ঠ জান্নাতবাসীর নেতা, কেবল নবী ও রসূলদের ব্যতিরেকে। হে আলী! তাদের উভয়কে (এ কথা) বলো না যেন। [এটি বলার সময় তিনি (সা.) হযরত আলীকে একথা বলতে নিষেধ করেন– এটি রেওয়ায়েতকারী বলেছেন।]

হযরত আনাস (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) তাঁর মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের কাছে বাহিরে আসতেন এবং বসা থাকতেন আর তাদের মাঝে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর থাকতেন। তাদের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর ছাড়া আর কেউই মহানবী (সা.)-এর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। তারা উভয়েই তাঁর (সা.) দিকে তাকাতেন আর তিনি (সা.) তাদের দিকে তাকাতেন। তারা তাঁর (সা.) দিকে তাকিয়ে হাসতেন আর তিনি (সা.) তাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে হাসতেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, তুমি হওযে (কাওসারে) আমার সঙ্গী আর (সওর) গুহায়ও আমার সঙ্গী।

হযরত জুবায়ের বিন মুতয়িম (রা.) বর্ণনা করেন, এক মহিলা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলে। তিনি (সা.) তার সম্পর্কে কোনো নির্দেশ প্রদান করেন। তখন সে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী বলেন, আমি যদি আপনাকে না পাই, অর্থাৎ আপনার তিরোধানের পর যদি আপনাকে আমার প্রয়োজন হয় তাহলে (আমি কী করব?)। উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমাকে না পেলে আবু বকরের কাছে আসবে। তিনি তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) একদিন বাহিরে আসেন এবং মসজিদে প্রবেশ করেন আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর এই দুইজনের মধ্য থেকে একজন তাঁর (সা.)-এর ডানদিকে আর দ্বিতীয়জন ছিলেন তাঁর (সা.)-এর বামদিকে। তিনি (সা.) তাদের উভয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, এভাবেই আমরা কিয়ামতের দিন উত্থিত হব।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হান্তাব (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-কে দেখে বলেন, তারা উভয়ে হলো কান ও চোখ, অর্থাৎ (তারা) আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আকাশের অধিবাসীদের মধ্য থেকে দু'জন সাহায্যকারী থাকে আর জগদ্বাসীদের মধ্য থেকেও দু'জন সাহায্যকারী থাকে। আকাশের অধিবাসীদের মধ্য থেকে আমার দু'জন সাহায্যকারী হলো জিব্রাঈল ও মিকাঈল। আর জগদ্বাসীদের মধ্য থেকে আমার দু'জন সাহায্যকারী হলো আবু বকর ও উমর। অতঃপর তাকে জান্নাতের সুসংবাদও প্রদান করেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা.) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) আমাকে বলেছেন, তিনি তার ঘর থেকে ওযু করে বাহিরে আসেন এবং বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে থাকব; আজ সারা দিন তাঁর (সা.) সাথেই থাকব। [অর্থাৎ তিনি সেই দিনটিকে তাঁর (সা.) সেবায় উৎসর্গ করেন।] তিনি

বলেন, তিনি মসজিদে এসে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে লোকেরা বলে, তিনি (সা.) বাইরে গিয়েছেন এবং ওই দিকে গিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর (সা.) পিছনে চলতে থাকি এবং তাঁর (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকি। ইতোমধ্যে তিনি (সা.) আরীস নামক কূপে যান; এটি কুবা মসজিদের নিকটবর্তী একটি কূপের নাম। আমি দরজার পাশে বসে পড়ি। এর দরজা ছিল খেজুর পাতার। রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে আসার পর ওযু করেন এবং আমি উঠে তাঁর (সা.) কাছে যাই। গিয়ে দেখি, তিনি (সা.) বে'রে আরীসের ওপর বসে আছেন। তিনি (সা.) সেটির প্রাচীরের মাঝ বরাবর (বসা ছিলেন) আর তাঁর পায়ের গোছা হতে কাপড় উঠানো ছিল এবং তিনি (সা.) এদুটিকে কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন; অর্থাৎ তাঁর উভয় পা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.)-কে আমি সালাম দেই। তারপর ফিরে এসে দরজায় বসে পড়ি। আমি (মনে মনে) বলি, আজ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রহরী হব। ইতোমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) আসেন এবং দরজায় ধাক্কা দেন। আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? তিনি বলেন, আমি আবু বকর। আমি বলি, একটু দাঁড়ান। এরপর আমি গিয়ে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু বকর এসেছেন, ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আসতে দাও আর তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি ফিরে এসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলি, ভেতরে আসুন, আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর ভেতরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ডানপাশে তাঁর (সা.) সাথে কূপের প্রাচীরের ওপর বসে পড়েন আর তিনিও নিজের পা মহানবী (সা.)-এর মতো কূপের ভেতর ঝুলিয়ে দেন এবং তার দুই পায়ের গোছা হতে কাপড় সরিয়ে রাখেন। আবার আমি ফিরে এসে বসে পড়ি। আমি আমার ভাইকে রেখে এসেছিলাম যেন সে ওযু করে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। আমি মনে মনে বলি, আল্লাহ্ যদি অমুকের মঙ্গল করার ইচ্ছা রাখেন তাহলে তাকে নিয়ে আসবেন [এর দ্বারা তিনি তার ভাইকে বুঝিয়েছিলেন।] হঠাৎ দেখি, কেউ একজন দরজা ধাক্কাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করি, কে আপনি? তিনি উত্তরে বলেন, আমি উমর বিন খাত্তাব। আমি বলি, একটু দাঁড়ান। এরপর আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে (সা.) সালাম দিয়ে বলি, উমর বিন খাত্তাব এসেছেন, তিনি (ভেতরে আসার) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি (সা.) বলেন, তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি এসে বলি, ভেতরে আসুন, আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি (রা.) ভেতরে এসে কূপের প্রাচীরের ওপর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাঁর বামপাশে বসে পড়েন এবং নিজের পা কূপের ভেতর ঝুলিয়ে দেন। পুনরায় আমি ফিরে এসে বসে যাই। আমি (মনে মনে) বলি, আল্লাহ্ যদি অমুকের মঙ্গল কামনা করেন তাহলে তিনি তাকে নিয়ে আসবেন। [পুনরায় তিনি তার ভাইয়ের কথা ভাবেন।] ইতোমধ্যে এক লোকে এসে দরজা ধাক্কাতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করি, কে আপনি? তিনি বলেন, আমি উসমান বিন আফ্‌ফান। আমি বলি, একটু অপেক্ষা করুন; আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সংবাদ দেই। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও। একই সাথে হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে তিনি (সা.) আরো বলেন, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যদিও তার ওপর একটি বড় বিপদ আপতিত হবে। আমি তাঁর কাছে এসে তাকে বলি, ভেতরে আসুন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, যদিও আপনার ওপর একটি বড় বিপদ আপতিত হবে। তিনি ভেতরে এসে দেখেন, (কূপের) প্রাচীরের এক পাশ পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই তিনি মহানবী (সা.)-এর বিপরীত দিকে মুখোমুখি হয়ে বসে পড়েন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন আর তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা.) ছিলেন। এমন সময় তা কাঁপতে আরম্ভ করে। তখন তিনি (সা.) বলেন, 'হে উহুদ, স্থির হও!' (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার মনে হয়, তিনি (সা.) এর ওপর পদাঘাতও করেছিলেন। 'কেননা তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই।'

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি ৯ ব্যক্তি সম্পর্কে এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতবাসী, আর দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও একই কথা বললে আমি পাপী হব না।' তারা জিজ্ঞেস করে, 'কীভাবে?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হেরা পাহাড়ে ছিলাম, এমন সময় সেটি কাঁপতে আরম্ভ করে।' প্রথমটি ছিল বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত আর এটি তিরমিযী শরীফের। এতে হেরার উল্লেখ রয়েছে। 'এ অবস্থায় মহানবী (সা.) বলেন, হে হেরা! স্থির থাক। নিশ্চয়ই তোমার ওপর একজন নবী, সিদ্দীক বা শহীদ রয়েছে। কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, সেই দশজন জান্নাতবাসী কারা? উত্তরে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.), আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)। তখন জিজ্ঞেস করা হয়, সেই দশম ব্যক্তি কে? ফলে সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি হলাম আমি।

এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, এই রেওয়ায়েতে সেই দশজন মহান মর্যাদাবান সাহাবীর উল্লেখ রয়েছে যাদেরকে তাদের জীবদ্দশাতেই মহানবী (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তারা মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ঠজনও ছিলেন আবার উপদেষ্টাও ছিলেন, যাদেরকে সীরাতের পরিভাষায় আশারায়ে মুবাশ্শারা বলা হয়, অর্থাৎ এমন দশজন লোক যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়টিও দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, মহানবী (সা.) শুধু দশজন সম্পর্কেই জান্নাতের সুসংবাদ দেন নি, বরং এছাড়াও আরো কতিপয় এমন পুরুষ এবং মহিলা সাহাবী রয়েছেন যাদেরকে তিনি (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন– এই দশজন ছাড়াও কমবেশি আরো প্রায় ৫০জন পুরুষ ও মহিলা সাহাবীর নামের উল্লেখও পাওয়া যায়। এছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়া প্রায় ৩১৩জন এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা আর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় বয়আতে রিযওয়ানে অংশ নেয়া লোকদের সম্পর্কেও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) (একদিন) বলেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে রোযা রেখেছে? তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমি রেখেছি। মহানবী (সা.) (আবার) বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে আজ জানাযার সাথে গিয়েছিল? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি। মহানবী (সা.) (পুনরায়) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কে আজ কোনো মিসকিনকে আহার করিয়েছে? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি করিয়েছি। মহানবী (সা.) (আবারও) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে আজ কোনো রোগীকে দেখতে গিয়েছিল? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি গিয়েছিলাম। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তির মাঝে এই সবগুলো বিষয় একত্রিত হয়ে গেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। এটি সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস হলো মহানবী (সা.) বলেন, জিব্রাঈল আমার কাছে এসে আমার হাত ধরেছে আর আমাকে জান্নাতের সেই দরজা দেখিয়েছে যেটি দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হায়! আমিও যদি আপনার সাথে থাকতাম তাহলে

আমিও সেটি দেখতে পেতাম। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তুমিই সেই ব্যক্তি যে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর বিষয়ে আরো বলতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) একবার বৈঠকে বসেছিলেন এবং তাঁর আশেপাশে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বসে ছিলেন, এমন সময় তিনি (সা.) বলতে আরম্ভ করেন, জান্নাত এরূপ এরূপ হবে। আর এরপর নেয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করেন যা তাঁর জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন। এসব কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! দোয়া করুন, জান্নাতে আমিও যেন আপনার সাথে থাকি। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরেকজন সাহাবীর নামও এসেছে আর কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম এসেছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি আশা করি, তুমি আমার সাথে থাকবে আর আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ দোয়াও করি যেন এমনই হয়। মহানবী (সা.) যখন এমনটি বলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্য সাহাবীদের হৃদয়েও এ ধারণা জন্মায় যে, আমরাও মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করি যেন আমাদের জন্যেও এমন দোয়া করা হয়। প্রথমে তাদের ধারণা ছিল, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে জান্নাতে থাকব– এত বড় সৌভাগ্য আমরা কোথায় পাব! কিন্তু যখন হযরত আবু বকর (রা.) অথবা কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী অন্য কোনো সাহাবী একথা বলেন আর মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়াও করেন, তখন তারা এ দৃষ্টান্ত পেয়ে যান এবং জেনে যান যে, এ বিষয়টি অসম্ভব নয়, বরং পুরোপুরি সম্ভব। অতএব আরেকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার জন্যও দোয়া করুন যেন আমাকেও খোদা তা'লা জান্নাতে আপনার সাথে রাখেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, খোদা তা'লা তোমার প্রতিও অনুগ্রহ করুন, কিন্তু যে প্রথমে নিবেদন করেছিল সে তো এই দোয়া নিয়ে নিয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি অমুক ইবাদতে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করবে তাকে জান্নাতের অমুক দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো হবে। আর যে ব্যক্তি তমুক ইবাদতে অধিকহারে অংশগ্রহণ করবে তাকে তমুক দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো হবে। এভাবে তিনি (সা.) বিভিন্ন ইবাদতের নাম উল্লেখ করে বলেন, জান্নাতের সাতটি দরজা দিয়ে বিভিন্ন পুণ্যকর্মের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপকারী লোকদের প্রবেশ করানো হবে। হযরত আবু বকর (রা.)-ও এই বৈঠকে বসে ছিলেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বিভিন্ন দরজা দিয়ে তাদের প্রবেশ করানোর কারণ হলো তারা একেকজন একেকটি ইবাদতের ওপর বেশি জোর দিয়েছিল। কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোনো ব্যক্তি যদি সবগুলো ইবাদতের ওপরই জোর দেয় তাহলে তার সাথে কী আচরণ করা হবে? তিনি (সা.) বলেন, তাকে জান্নাতের সাতটি দরজা দিয়েই প্রবেশ করানো হবে; আর হে আবু বকর! আমি আশা করি তুমিও তাদের অর্ন্তভুক্ত হবে।

এই আলোচনা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্। এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব আর পরে তাদের জানাযাও পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ ইন্দোনেশিয়া জামাতের আমীর জনাব আব্দুল বাসেত সাহেবের। তিনি ৮ অক্টোবর ৭১ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ সুমাত্রী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ২১ বছর বয়সে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন। ১৯৮১ সালের শুরুতে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে শাহেদ পাশ করেন। ১৯৮১ সালেই মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি নিজ দেশ ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে যান। ৮৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার মজলিসে

আমেলার পরামর্শক্রমে এ পরিকল্পনা গৃহীত হয় যে, থাইল্যান্ডে তবলীগের উদ্দেশ্যে একজন ইন্দোনেশিয়ান মুবাল্লিগকে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের নাগরিকত্ব নিয়ে থাইল্যান্ডে তবলীগের জন্য প্রেরণ করতে হবে। তখন তার নাম উপস্থাপিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) মঞ্জুরী প্রদান করেন। ফলে তিনি থাইল্যান্ডে চলে যান। পরবর্তীতে তার পদায়ন হয় ইন্দোনেশিয়াতে এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়াতেই অবস্থান করেন আর এক দীর্ঘকাল আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপ্তিকাল ৪০ বছর। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে।

তার স্ত্রী মুসলী ওয়াদী সাহেবা বলেন, জামাতের প্রতি মরহুমের গভীর ভালোবাসা ছিল আর জামাতকে সর্বদা সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন। আমি তার স্ত্রী হিসেবে জামাতের প্রতি তার একাগ্রতা ও সেবার বিষয়টির সাক্ষ্য দিচ্ছি।

তার এক ভাতিজা তাহের সাহেব বলেন, মরহুম কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনাবলীর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতেন। একবার মরহুম বলেন, পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য মালয়েশিয়া যাবার প্রোগ্রাম ছিল আর এজন্য বিমানের টিকেটও ক্রয় করা ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, আনুমানিক এক সপ্তাহ পর যখন পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তখন তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি মালয়েশিয়া যান নি কেন? তিনি উত্তরে বলেন, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যে পত্র পেয়েছি তাতে যাওয়ার অনুমতি পাই নি, তাই আমি মালয়েশিয়া যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছি; আর তিনি টিকিটেরও কোনো পরওয়া করেন নি।

তার সাথে কাজ করতেন এমন একজন কর্মকর্তা বলেন, তিনি খুবই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে কাজ শিখাতেন ও বুঝাতেন। জামাতের আমীর হওয়া সত্ত্বেও জামাতের কাছ থেকে তিনি সুযোগ সুবিধা চাইতেন না। জামাতের পক্ষ থেকে যা-ই পেতেন খুশি মনে তা ব্যবহার করতেন। সাদাসিধে জীবনকে প্রাধান্য দিতেন। অফিসের সময় প্রায়শই তিনি আমাদের কাছে এসে বসে যেতেন এবং চিঠিপত্র দেখে নোট লিখাতেন। মুবাল্লিগদের খুবই সম্মান করতেন। তিনি খুবই গভীর ও বিস্তর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যখনই তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, সর্বদা আমেলার সদস্যদের কাছে পরামর্শ চাইতেন। গাম্ভীর্যের অধিকারী কিন্তু বিনয়ে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খুবই মিশুক এবং ছোট-বড় সবার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। আমাদের উপদেশ দিয়ে বলতেন, নিজেদের সকল মতামত পিছনে রেখে তাৎক্ষণিকভাবে যুগ-খলীফার নির্দেশের অনুসরণ করা উচিত। জামাতের ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিতেন। জামাতি সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি সর্বোচ্চ সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যে কোনো অনিয়ম তিনি কঠোর হস্তে দমন করতেন। অধিকাংশ সময়ই অন্যান্য কর্মীচারীদের পূর্বে অফিসে আসতেন। কোনো কারণে অফিসে আসতে না পারলে বা আসতে দেরি হলে স্টাফকে অবশ্যই অবহিত করতেন। বরং তিনি যদি কোনো কাজে অফিস থেকে বাইরে যেতেন, সামান্য সময়ের জন্যেও যদি যেতে হতো তবুও অফিসের কর্মচারীদের অবশ্যই অবহিত করে যেতেন। বিভিন্ন রিপোর্ট ও চিঠিপত্র চেক করার সময় মরহুম খুবই সতর্ক থাকতেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি জিনিস দেখতেন আর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কাজ করতে হলে গভীর রাত পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আহমদী সদস্যরা বলেন, আহমদীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে তিনি আমাদের সন্তানদের জন্য অবশ্যই সাথে উপঢৌকন নিয়ে যেতেন। সর্বদাই স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন যিনি সর্বদা অন্যকে খুশি করার চেষ্টা করতেন। আমীর সাহেব আমাদের জন্য এবং ইন্দোনেশিয়ার আহমদীদের জন্য বলতে গেলে আধ্যাত্মিক পিতা ছিলেন। জামাতি ব্যবস্থাপনা ও ঐতিহ্যকে সর্বদা প্রাধান্য দিতেন। [একজন আমীরের

মাঝে অবশ্যই এই গুণগুলো থাকা উচিত।] তিনি যখন অসন্তুষ্ট হতেন তখনো প্রত্যেকের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখতেন; [রাগের মাথায় যা ইচ্ছে বলে দিলাম– এমন নয়।] কোনো শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি সংশোধনের বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতেন। এক্ষেত্রে কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষ থাকতো না, বরং সংশোধনই আসল উদ্দেশ্য থাকতো। এরপর বলেন, অনেক আহমদী এখানে তাদের জামাতি বা ব্যক্তিগত কাজে তার কাছে দিক নির্দেশনা চাইতেন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও ভালোবাসার সাথে ইন্দোনেশিয়া জামাতের সদস্যদের খেয়াল রেখেছেন। গত বছর থেকে তার অসুস্থতার দিনগুলোতেও রীতিমত বিভিন্ন সভা-সমাবেশ এবং গণসংযোগ ও সফরে জামাতের কাজ করতে থাকেন; এতে কোনো কমতি আসতে দেন নি, যদিও গত এক বছর যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

লন্ডনস্থ ইন্দোনেশিয়ান ডেস্ক-এ কর্মরত মাহমুদ ওয়ারদী সাহেব বলেন, তার স্বভাবের কোনো কোনো দিক খুবই উল্লেখ করার মত। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তার জ্ঞানের পরিধি। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু মানুষ ছিলেন। সারাক্ষণ জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ রাখতেন। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান রাখতেন। যে বিষয়েই কথা হতো তিনি তাতে জ্ঞানগর্ভ চমৎকার আলোচনা করার যোগ্যতা রাখতেন। জামাতি বইপুস্তকের জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ জ্ঞানেও তার দখল ছিল। নিয়মিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা অধ্যয়ন করতেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব ধরনের খবরাখবর পড়তেন, তা ইন্দোনেশিয়ান ভাষাতেই হোক বা ইংরেজী ভাষায়ই হোক। বক্তৃতা করার সময় অধিক দীর্ঘ বক্তৃতা করতেন না, বরং সর্বদাই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতায় সর্বদা অত্যন্ত সাবলীল এবং সরল ভাষায় লোকদেরকে বুঝাতেন। সব শ্রেণির লোকই তার কথা অনায়াসে বুঝতে পারতো। তিনি আরো বলেন, দৈনন্দিন জীবনে তিনি অত্যন্ত সাদামাটা কাপড় পরিধান করতেন, কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ মানুষ ছিলেন। কোনো ধরনের লৌকিকতা বা কৃত্রিমতা একেবারেই ছিল না। সকল শ্রেণির মানুষই তাঁর সাথে বসে অনায়াসে কথাবার্তা বলতে পারতো। কিন্তু সর্বদাই লোকেরা তার সম্মান ও পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সাথে কথা বলতো।

সেখানকার জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক ও মুরব্বী সিলসিলাহ্ ফযলে ওমর ফারুক সাহেব বলেন, শৈশব থেকেই আমি আমীর সাহেবের সাথে ছিলাম। ইন্দোনেশিয়ার জামাত যখন চরম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ছিল তখন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম, ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে জামাতের সদস্যদের সাহস যোগাতেন। তাদেরকে ধৈর্যধারণ ও দোয়া করার উপদেশ দিতেন। তিনি যখনই দোয়া করতেন তখন বিগলিতচিত্তে দোয়া করতেন। নামাযের জন্য সর্বদা সময়মত মসজিদে আসতেন। ওয়াকেফীনে জিন্দেগীদের অনেক খেয়াল রাখতেন। কোনো মুরব্বী কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় নিজের পক্ষ থেকে তিনি কোন না কোনো উপহার অবশ্যই দিতেন।

জামেয়ার আরেক শিক্ষক সাইফুল্লাহ্ মুবারক সাহেব বলেন, মওলানা আব্দুল বাসেত সাহেব ওয়াকেফীনে জিন্দেগীদের জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন। জামাতের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সর্বদা অংশগ্রহণ করতেন। সবার সাথেই নম্রতা ও সম্মানের সাথে কথা বলতেন। যেকোনো মজলিসে তার উপস্থিতির ফলে তা আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে যেত। সর্বদাই তিনি হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। তিনি বলেন, আমি যখন জামেয়া ইন্দোনেশিয়াতে পড়তাম তখন মাগরিবের নামাযের পর তিনি আমাদের সাথে বসতেন এবং আমাদের খোঁজখবর নিতেন এবং হালকা রসিকতা করতেন।

মুরব্বী সিলসিলা নূরুদ্দীন সাহেবও লিখেছেন, তিনি এমন একজন আমীর ছিলেন যিনি নিজের আদর্শ উপস্থাপন করতেন। তিনি লিখেন, ২০১৮ সনে তিনি আমাদের মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। ওই

সময় আমাদের কাছে ছয় কোটি (ইন্দোনেশিয়ান) টাকা ছিল। [ইন্দোনেশিয়ান টাকার মূল্যমান খুবই কম, তাই সেখানে কোটি এবং মিলিয়ন ও বিলিয়নে কথা বলা হয়।] তিনি বলেন, আমাদের কাছে ছয় কোটি টাকা ছিল। কিন্তু মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল। আমীর সাহেব উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মসজিদ নির্মাণের জন্য যতটা অর্থই সংগ্রহ হয়েছে তা দিয়েই নির্মাণকাজ শুরু করে দিন। কিন্তু এরপর আমরা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের নিদর্শন দেখব; ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ১৫০ কোটি ইন্দোনেশিয়ান টাকার প্রয়োজন হলেও তোমাদের কাছে যে ৬ কোটি আছে তা দিয়েই কাজ শুরু করে দাও। এটি (চাহিদার) ১০ ভাগের ১ ভাগও নয়। তিন শতাংশ, না বরং চার শতাংশ। এই উপদেশ দেয়ার পর তিনি তার পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে আমাদের মসজিদের জন্য কিছু অর্থ প্রদান করেন। এখান থেকেই জামাতের সদস্যরাও অধিকহারে নিজেদের উত্তম কুরবানী উপস্থাপন করতে আরম্ভ করেন। এভাবে দুই বছরের মধ্যেই আমাদের মসজিদের নির্মাণকাজ ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে যায়। এরপর এই মহামারীর যুগ আসে, মানুষের আয় কমে যায়। ফলে মসজিদের নির্মাণকাজ থেমে যায়। তিনি বলেন, আবারও আমরা তার কাছে গিয়ে বলি, মসজিদের কাজ সম্পন্ন করতে চাই, কিন্তু এখনো প্রায় ১৫ কোটি তথা ১৫০ মিলিয়ন টাকার প্রয়োজন। আমরা আশা করছিলাম কেন্দ্র আমাদেরকে সাহায্য করবে। কিন্তু আমীর সাহেব বলেন, কেন্দ্র কোনো সাহায্য করবে না আর আপনারা কারো কাছে না চেয়ে নিজেরাই এ অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেখানে কতজন আহমদী আছে? আমি বলি, ১৬০জন আহমদী আছে। একথা শুনে তিনি সাবলীলভাবে মুচকি হেসে বলেন, প্রত্যেকে ১০ মিলিয়ন [এখানকার হিসেবে প্রায় ১০০ বা ১২৫ পাউন্ড] করে দিয়ে দিলেই এই অংক পূর্ণ হতে পারে। তিনি বলেন, প্রথমদিকে আমাদের বিশ্বাস হয় নি যে, একাজ এত সহজে হতে পারে। কিন্তু আমরা যখন তার উপদেশ অনুসারে কাজ করতে আরম্ভ করি তখন (আল্লাহ্ তা'লা) জামাতের সদস্যদের হৃদয়ে এক ভালোবাসা ও প্রেরণার সঞ্চার করেন যেন তারা নিজেদের সর্বোত্তম সম্পদ মসজিদ নির্মাণের জন্য উপস্থাপন করে। এছাড়া তিনি নিজের পক্ষ থেকে আবারও যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন। ফলে তিন বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে যায়।

শুধু আহমদীই নয়, বরং অ–আহমদীদের সাথেও তার সুসম্পর্ক ছিল। সা**বেক ধর্মমন্ত্রী লুকমান হাকীম সাইফুদ্দীন সাহেব বলেন**, [তিনি আহমদী নন;] মরহুমকে আমি একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব মনে করি। তিনি সর্বদা মানবতাকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি যেখানেই যেতেন সবর্দা এবিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন যে, কীভাবে আমরা মানুষের সম্মান, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং সকলের প্রতি যত্নবান হতে পারি। তিনি বলেন, আমার মতে এসব বিষয়ে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। কেবল আহমদীদের নয়, বরং ইন্দোনেশিয়ার সব মানুষের দায়িত্ব হলো আমরা যেন তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি এবং তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে যেসব উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি। আমাদের মাঝে যতটা বিভেদ ও পার্থক্য রয়েছে তা কেবল পরস্পরের মাঝে ঘৃণা ও মানুষের সম্মান বিনষ্ট করার কারণ হয়ে থাকে। তাই সেগুলো দূর করতে হবে।

ইন্দোনেশিয়ায় তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রদূত যুহায়রি সাহেব লিখেন, আমি আমীর সাহেবের কাছ থেকে এটি শিখেছি যে, কীভাবে আমরা মহানবী (সা.), তাঁর আহলে বায়ত এবং আলেম সম্প্রদায়কে ভালোবাসব এবং তাদের উন্নত শিক্ষার অনুসরণ করব। যদিও আহমদীদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, গালাগালি করা হয়েছে; [ইন্দোনেশিয়াতে অনেক অত্যাচার হয়েছে আর তিনি সেখানে অনেক বীরত্বের সাথে সেই যুগ

অতিবাহিত করেছেন এবং খুবই উত্তমরূপে সব আহমদীকে রক্ষা করেছেন।] যাহোক, তিনি লিখেন, যদিও আহমদীদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, গালাগালি করা হয়েছে এবং অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, তবুও আমীর সাহেব আমাদেরকে এটি শিখিয়েছেন যে, সর্বাবস্থায় আমাদেরকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে ধর্ম, দেশ ও মানবতার সেবা করা উচিত। কেননা সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের বিশ্বাস হলো, Love for all, hatred for none। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমীর সাহেব আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়পাত্র, আলেম, নির্মল মনের অধিকারী এবং চরিত্রবান একজন মানুষ ছিলেন।

জাতীয় পর্যায়ের একটি সংগঠনের নেতা নিয়া শরীফ উদ্দীন সাহেবা লিখেন, আমীর সাহেবের কথা বলার ভঙ্গিমা অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। যদিও তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলতেন, কিন্তু তাতে দেশপ্রেমের আবেগ স্পষ্ট ছিল। এক কথায়, তার কথা থেকে Love for all, hatred for none প্রকাশ পেত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মরহুম অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন এবং এমন নেতা ছিলেন যিনি সর্বদা ঈমান ও সকলের প্রতি ভালোবাসার চেতনা নিয়ে কথা বলতেন।

মিরাজ উদ্দীন শাহেদ সাহেব লিখছেন, তিনি আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ইন্দোনেশিয়া জামাতকে অনেক বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়ার বেশ কয়েকটি স্থানে আহমদীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এবং ঠাণ্ডা মাথায় এগুলোর মোকাবিলা করেন। সরকারী কর্মকর্তারাও তাকে সম্মান করতেন। এটি তার উত্তম গণসংযোগেরই প্রতিফলন।

জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রিন্সিপাল মাসুম সাহেব লিখেন, আমীর সাহেব খিলাফতের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে প্রায় সময়ই তিনি নামাযের জন্য আমার সাথে মসজিদে যেতেন। তিনি যখনই সফরে যেতেন তখন অবশ্যই একথা বলে যেতেন, অমুক জামাতে সফরে যাচ্ছি; আর আমাকেও বলতেন, তুমিও সফরে যাও। জামেয়া আহমদীয়ার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। জামেয়া আহমদীয়ার বোর্ড মেম্বার হিসেবে ছাত্রদের ইন্টারভিউ নেয়ার সময় সর্বদা এই উপদেশ দিতেন যে, আপনারা যেহেতু মুবাল্লিগ হবেন তাই জামাতের জন্য সবদিক দিয়ে আদর্শ হওয়ার চেষ্টা করুন। তিনি বলেন, আমাকেও দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন এবং প্রত্যেকের সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বলতেন যে, অমুক ছাত্রের মাঝে কী ঘাটতি রয়েছে; তা পূর্ণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। জামেয়ার ছাত্রদের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল।

আমেরিকার মুরব্বী সিলসিলা আরশাদ মালহী সাহেব বলেন, বাসেত সাহেব জামেয়াতে আমার সহপাঠী ছিলেন এবং আমার রুমমেটও ছিলেন। আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তুখোড় মেধাবী, প্রফুল্লচিত্ত, মিশুক ও হাস্যোজ্জ্বল প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। খুব ভালোমানের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন। রাবওয়াতে তিনি সবসময় জয়ী হতেন। তিনি বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি যখন ইন্দোনেশিয়া থেকে রাবওয়া জামেয়াতে আসছিলেন সেই দিনগুলোতেই তিনি কোনো কোম্পানির পক্ষ থেকে খেলোয়াড় হিসেবে অনেক বড় একটি প্রস্তাব পান। ফলে তাঁর পিতা মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (একথা ভেবে) খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন, আব্দুল বাসেত পাছে এই বড় প্রস্তাবের লোভে পড়ে জামেয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা না পরিত্যাগ করে। আমীর সাহেব বলেন, তিনি যখন তার পিতার (চেহারায়) দুশ্চিন্তার ছাপ দেখেন তখন পিতাকে আশ্বস্ত করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, কখনোই আমি জাগতিক স্বার্থে ধর্মকে পরিত্যাগ করব না; আর এভাবে তিনি অনেক বড় অঙ্কের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তার সারাটা জীবন সাক্ষী, তিনি ধর্মকে সদা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য

দিয়েছেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। খিলাফতের প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন এবং নিবেদিতপ্রাণ ও আত্মত্যাগী সত্তা ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর অনেক নৈকট্যভাজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁকে টিপ্পনি কেটে বলতাম, আপনি তো হযরত খলীফতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর পছন্দের পাত্র! অনুরূপভাবে প্রত্যেক খিলাফতের যুগেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং জামাতকে আল্লাহ্ তা'লা তার মতো আরো মুবাল্লিগ ও কর্মী দান করতে থাকুন। যেভাবে আমি বলেছি, আমি নিজেও তাকে পূর্ণ আনুগত্যকারী এবং নিঃস্বার্থ মানুষ হিসেবে পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াত ব্যক্তিদের শূন্যতাও পূরণ করতে থাকুন। বিশেষত ইন্দোনেশিয়ার সকল মুরব্বী ও মুবাল্লিগকে তার আদর্শ দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। পৃথিবীর অন্য সকল মুবাল্লিগের জন্যও (একই কথা প্রযোজ্য)। এগুলো অতীতের কথা নয়; এসব লোক ছিলেন বর্তমান যুগের যারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ওয়াকফের দাবি পূর্ণ করেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ **যয়নাব রমযান** সাহেবার। তিনি তানজানিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব ইউসুফ উসমান কাম্বালা সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাঁর স্বামী ইউসুফ উসমান কাম্বালা সাহেব বর্ণনা করেন, অধমের সহধর্মিনী খুবই পুণ্যবতী, নিষ্ঠাবান এবং জামাতের প্রত্যেক কাজে অংশগ্রহণকারী মহিলা ছিলেন। প্রতিবেশিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। দরিদ্র ও এতিমদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। মুরব্বীদের অনেক সেবা ও সম্মান করতেন। চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। আমরা যেখানেই থেকেছি সেখানেই তিনি সর্বদা জামাতের কাজে সম্মুখ সারিতে থাকতেন। সকল আহমদীর সাথে খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করতেন। দুই-আড়াই বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। চিকিৎসা করিয়েছি আর অনেক ভালো ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি প্রাধান্য পেয়েছে আর কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, জানাযায় শামিল হওয়ার জন্য টোবুরা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের মাঝে অ–আহমদী আত্মীয়স্বজনও অংশগ্রহণ করেছিল। তার তিন পুত্র এবং তিন কন্যা রয়েছে, তারা সবাই বিবাহিত। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ কাদিয়ানের দরবেশ শেখ আব্দুল কাদির সাহেবের সহধর্মিনী হালিমা বেগম সাহেবার। গতমাসে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমা নিয়মিত নামায রোযায় অভ্যস্ত, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞচিত্ত, বিনয়ী এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী মহিলা ছিলেন। সন্তানদের নামায এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত করার জন্য পরিশ্রম করতেন। যতদিন স্বাস্থ্য ভালো ছিল কাদিয়ানের শিশুদের পবিত্র কুরআন পড়াতেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসা ছিল এবং যুগ–খলীফার পক্ষ থেকে ঘোষিত প্রত্যেক তাহরীকে অংশ নিতেন। দরবেশী জীবনকে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। দারিদ্র সত্ত্বেও কখনো কোনো ভিক্ষুককে খালি হাতে যেতে দিতেন না। মরহুমার ঘর দারুল মসীহ্‌র নিকটে হওয়ায় জলসা সালানার দিনগুলোতে মেহমানে ভরা থাকতো। মেহমানদের হাস্যবদনে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের সর্বোত্তম আতিথেয়তা করতেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তার পুত্র শেখ নাসের ওয়াহিদ সাহেব নূর হাসপাতাল, কাদিয়ানের ভারপ্রাপ্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছেন। তার তিন কন্যা রয়েছে, তারা প্রবাসী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ কিরিবাতির শ্রদ্ধেয়া **মেলে আনিসা এপিসাই** সাহেবার। তার জীবনীও বিস্ময়কর এবং আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনাও বিস্ময়কর। অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী, বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী মহিলা ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। কিরিবাতির মুরব্বী খাজা ফায়েয সাহেব বলেন, মেলে আনিসা এপিসাই সাহেবা কিরিবাতি জামাতের প্রথম মুসলমান এবং প্রথম আহমদী ছিলেন। পৃথিবীর এক প্রান্তে কোনোভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের একটি কপি খুঁজে পান। এমন একটি স্থান যেখানে অন্যান্য জিনিসের পাশাপাশি বইপুস্তকও কালেভদ্রেই দৃষ্টিগোচর হতো। পবিত্র কুরআনের এই অনুলিপিটি পাওয়ার পর তিনি নিজেই তা পড়তে শুরু করেন। (হয়তো) এর সাথে অনুবাদ ছিল। এটি পড়ার পর মোহতরমা মেলে আনিসা এপিসাই সাহেবার ওপর পবিত্র কুরআনের এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, আপন মনেই তিনি ঈমান নিয়ে আসেন এবং তখন থেকেই পর্দা করা শুরু করেন। আহমদীয়া জামাতের প্রথম মুবাল্লিগ মরহুম হাফেয জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব কিরিবাতি পৌঁছার পর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এই দেশে কোনো মুসলমান আছে? তখন সবাই মোহতরমা মেলে আনিসা এপিসাই সাহেবার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, গোটা দেশে কেবল একজনই রয়েছেন যিনি মুসলমান। খোদার কেমন অনুগ্রহ যে, মোহতরমা মেলে আনিসা এপিসাই সাহেবা মনে মনে ইসলাম গ্রহণ করার পর এক বছরের মধ্যেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের মুবাল্লিগ সেখানে পৌঁছেন। এই বীর যুবতী নারী ততদিনে নিজ পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের মাঝে ইসলামের তবলীগ করা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, সেখানে জামাতের মুবাল্লিগ পৌঁছানোর পূর্বেই। আর এ কারণেই এই ছোট্ট দেশে, যার জনসংখ্যা এক লক্ষ ছিল, একজন নারী মুসলমান হয়ে গেছে– এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য যখন জামাতের মুবাল্লিগ হাফেয জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব কিরিবাতি নামক দেশে পৌঁছেন তখন আল্লাহ্ তা'লা পূর্ব থেকেই তাকে একজন 'সুলতানে নাসীর' দান করে রেখেছিলেন, যিনি জামাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। একমাত্র মুসলমান হওয়া, পর্দা করা এবং লোকদেরকে তবলীগ করার কারণে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। প্রথম মুবাল্লিগ জিব্রাঈল সাহেব কিরিবাতি আসার পর মোহতরমা মেলে আনিসা সাহেবা বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তিনি মুবাল্লিগ সিলসিলার থাকার ব্যবস্থা করেন আর তার অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। এরপর তবলীগে আত্মনিয়োগ করেন। তার তবলীগে বেশ কয়েকজন জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। জামাতের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। মুরব্বীদের তিনি অনেক সম্মান করতেন। মানুষের কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর ঈমান কখনো দুর্বল হয় নি। যেখানেই যেতেন পর্দা করে যেতেন এবং তার মুসলমান পোশাকও তবলীগের মাধ্যম হয়ে যায়। যদিও মানুষ তাকে নিয়ে উপহাস করতো, কখনো গালি দিত, বিতর্ক করতো, বিরক্ত করতো, কিন্তু এরপরও কখনোই তিনি নিজের ঈমান ও পর্দাকে নষ্ট হতে দেন নি। বরং (একথা বলে) একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, পর্দা যেহেতু খোদার জন্য, সেক্ষেত্রে লোকে কী বলে তা নিয়ে আমার কিসের মাথা ব্যথা? প্রাথমিক পর্যায়ে যখন তিনি মনে মনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন নামায পড়া জানতেন না। ফলে সিজদা ছাড়াই নিজের মত করে ইবাদত করতে আরম্ভ করেন। তার পিতা তাকে নতুন রীতিতে ইবাদত করতে দেখে ভীষণ রাগান্বিত হন এবং কুরআন শরীফ ছিঁড়ে ফেলার হুমকি দেন। তখন তার পিতাকে তিনি বলেন, তাহলে তো বাইবেলের সেসব পৃষ্ঠাও ছিঁড়ে ফেলা উচিত যাতে খোদার সম্মুখে হযরত ঈসার সিজদা করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি তার বিশ্বাসে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অটল থাকেন। পরে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের মুবাল্লিগের আগমনের কারণে তিনি নিজেও নামায পড়া শিখেন এবং পরে লোকদেরকেও শেখান। পৃথিবীর সেই

একপ্রান্তে যখন সব লোকই ইসলামকে মন্দ দৃষ্টিতে দেখত, সেই সময় এই সংগ্রামী নারী দণ্ডায়মান হয়ে সবার মোকাবিলা করতেন এবং নির্ভয়ে ইসলামের শিক্ষামালা উপস্থাপন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া তিনি আর কাউকেই ভয় পেতেন না। এই গুণের জন্য অনেক লোক এবং রাজনীতিবিদদের ওপরও তার গভীর প্রভাব ছিল। আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, তার এই প্রভাব এবং অটল বিশ্বাসের দরুন রাজনীতিবিদদের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি হয় এবং প্রভাব পড়ে যে, জামাতের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও তারা সাহায্য করে। অথচ ইতোপূর্বে বিরোধিতার কারণে এটি মঞ্জুর হচ্ছিল না। তার এমন প্রভাব ছিল যে, তার পরিচিত অনেক লোক তার উপস্থিতিতে ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো নেতিবাচক কথা বলার সাহস পেত না। তিনি তার বাড়ির দরজা সর্বদা উন্মুক্ত রাখতেন যেন লোকেরা আসতে পারে, আর যে প্রশ্নই করতে চায় তা করতে পারে। বাড়ির সবাইকে নিয়মিত নামায পড়ার জন্য তাগাদা দিতেন। নিজের বাড়িকেই অনেক দিন যাবৎ নামায সেন্টার বানিয়ে রেখেছিলেন। তার পুত্র আহমদ এপিসাই যুবক বয়সে উপনীত হলে তাকে জামাতের জন্য উৎসর্গ করে জামেয়া আহমদীয়া ঘানাতে পাঠিয়ে দেন। লোকেরা তাকে অনেক বাধা দিচ্ছিল আর বলছিল, তুমি কেন তোমার ছেলেকে সেখানে পাঠাচ্ছ? তারা সেখানে তোমার ছেলেকে মেরে ফেলবে। তথাপি তিনি সগর্বে তার পুত্রকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি এমন ছিল যে, আফ্রিকায় গিয়ে আহমদ এপিসাই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয় আর সেখানেই মারা যায়। তখন এসব লোকই এসে বলে, দেখ! ইসলাম মিথ্যা ধর্ম, তাই তোমার ছেলে মারা গেছে। কিন্তু মেলে আনিসা এপিসাই সাহেবা তাদের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি এবং কোনো গুরুত্ব দেন নি, বরং ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন আর ইসলামের জন্য পূর্বের চেয়েও আরো বেশি জোরালোভাবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। (এর ফলে) তার ঈমান বা পর্দার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি। তার অন্য সন্তানেরাও ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবলীগও চলমান থাকে। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৈর্যধারণ করার সামর্থ্য দিন আর মায়ের মতো ইসলাম এবং আহমদীয়াতের সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন। সেখানে রোপিত তার বীজে আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করুন এবং তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ছোট্ট এই দ্বীপটি যেন আহমদীয়াতের কোলে ঠাঁই পায়। আল্লাহ্ তা'লা এমন নির্ভীক, নিজ আদর্শ উপস্থাপনকারী, তবলীগে আগ্রহী এবং নিজ ঈমানে অটল নারী জামাতকে আরো বেশি দান করতে থাকুন। আরো এমন মা দান করতে থাকুন যারা মুবাল্লিগদের চেয়েও বেশি তবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন, (আমীন)।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক কর্তৃক অনূদিত)